ঢাকার পতনের জন্য দায়ী কে?

পর্ব- ২

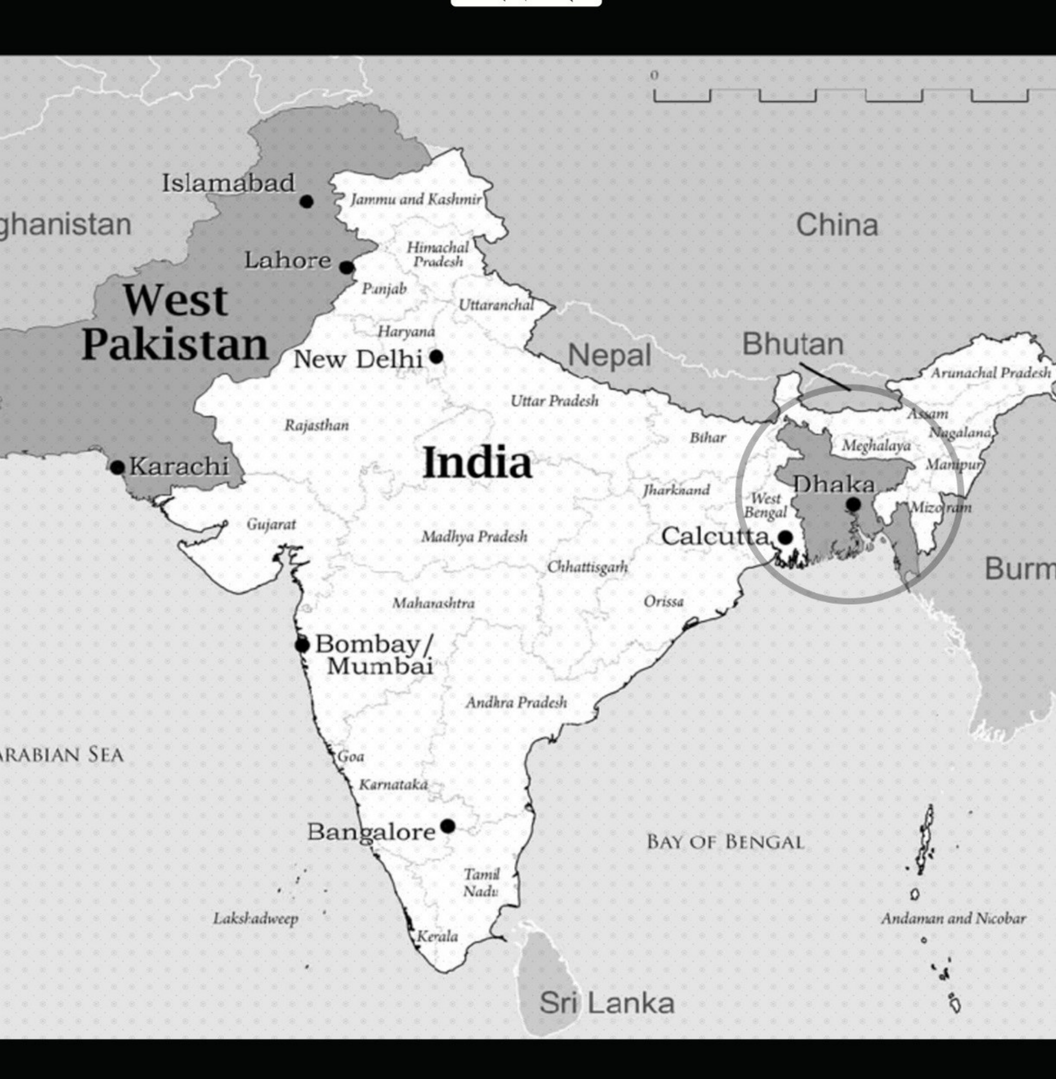

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ

ঢাকার পতনের জন্য দায়ী কে ?

(পর্ব - ২)

মুল

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ

অনুবাদ বিভাগ

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ -দাওয়াতি ওয়ান - নুসরাহ

ঢাকার পতনের জন্য দায়ী কে? (পর্ব – ২) • 3

ঢাকার পতনের জন্য

দায়ী কে?

(পর্ব - ২)

মুল

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ
অনুবাদ বিভাগ
আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ

• প্রথম প্রকাশ
রজব ১৪৪৪ হিজরী
ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ইংরেজি

• স্বত্ব
সকল মুসলিমের জন্য সংরক্ষিত

• প্রকাশক
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ
ওয়েবসাইটঃ https://fatwaa.org
ইমেইলঃ ask@fatwaa.org
ফেসবুকঃ https://fb.me/fatwaa.org টুইটারঃ
https://twitter.com/fatwaa_org_1

ইউটিউবঃ
https://www.youtube.com/@fatwaa_org
টেলিগ্রামঃ https://t.me/fatwaa_org

- মূল্য
  বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

এই বইয়ের স্বত্ব সকল মুসলিমের জন্য সংরক্ষিত। পুরো বই, বা কিছু অংশ অনলাইনে (পিডিএফ, ডক অথবা ইপাব সহ যে কোন উপায়ে) এবং অফলাইনে (প্রিন্ট অথবা ফটোকপি ইত্যাদি যে কোন উপায়ে) প্রকাশ করা, সংরক্ষণ করা অথবা বিক্রি করার অনুমতি রয়েছে। আমাদের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে শর্ত হল, কোন অবস্থাতেই বইয়ে কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন করা যাবে না।

- কর্তৃপক্ষ

ঢাকার পতনের জন্য দায়ী কে? (পর্ব – ২) • 6

সূচিপত্র

মুজিবুর রহমানের কার্যকলাপ......................7 মুজিব.. একজন গাদ্দার ও বিশ্বাসঘাতক........8 মুজিব একজন স্বদেশপ্রেমী........................10 সিরাজ এবং নিউক্লিয়াস সেল.....................19 ভুট্টোর ভূমিকা..21 ঢাকার পতনের জন্য দায়ী কে?......................23 ফলাফল ও শিক্ষা...25

সম্পাদকের কথা

প্রিয় তাওহীদবাদী ভাই ও বোনেরা ! মুহতারাম উস্তাদ আবু আনওয়ার আল হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ ’র ‘ঢাকার পতনের জন্য দায়ী কে **? (পর্ব – ২)**’ গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা আপনাদের সম্মুখে বিদ্যমান। গুরুত্বপূর্ণ এই লেখায় তিনি ঢাকার পতনের জন্য দায়ী কে ? ইসলামের নামে যে পাকিস্তান দেশটি তৈরি হয়েছিলো , ১৯৭১ সালে তা দ্বিখণ্ডিত হওয়ার জন্য দায়ী কে ছিলো ? পাকিস্তানে এই প্রশ্নের উত্তর , বাংলাদেশে এই প্রশ্নের উত্তর এবং ভারতে এই প্রশ্নের উত্তর কি ? আর তার প্রকৃত বাস্তবতা কি ? তা সংক্ষেপে এবং সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। নিঃসন্দেহে এই প্রবন্ধে আমরা ঢাকার পতনের জন্য দায়ী কে ? তা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

এই লেখাটির উর্দু সংস্করণ ইতিপূর্বে ‘ কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ শাখা ’র অফিসিয়াল উর্দু ম্যাগাজিন ‘নাওয়ায়ে গাযওয়ায়ে হিন্দ ’ এর গত জানুয়ারি ২০২৩ ইংরেজি সংখ্যায় ‘সুক্বুতে ঢাকাহ্ কা জিম্মাহ্দার কোন ?’ (سقوط ڈھاکہ کا ذمہ دار کون؟) শিরোনামে প্রকাশিত হয়। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই লেখাটির মূল বাংলা অনুবাদ আপনাদের সামনে পেশ করছি।

আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

আম-খাস সকল মুসলিম ভাই ও বোনের জন্য এই রিসালাহটি ইনশাআল্লাহ উপকারী হবে। সম্মানিত পাঠকদের কাছে নিবেদন হলো- লেখাটি গভীরভাবে বারবার পড়বেন, এবং নিজের করণীয় সম্পর্কে সচেতন হবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ এই রচনাটি কবুল ও মাকবুল করুন! এর ফায়দা ব্যাপক করুন! আমীন।

সম্পাদক
29 ই রজব, ১৪৪৪ হিজরী
21 ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ইংরেজি

ঢাকার পতনের জন্য

দায়ী কে?

(পর্ব - ২)

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ

মুজিবুর রহমানের কার্যকলাপ

পাকিস্তানে মুজিবুর রহমানকে একজন গাদ্দার ও বিশ্বাসঘাতক মনে করা হয়। পাকিস্তান বিভক্তির পেছনে মূল অপরাধী তাকেই জ্ঞান করা হয়। অপরদিকে বাংলাদেশে

মুজিবকে জাতীয় বীর ও নেতা মনে করা হয়। শুধু তাই নয়; বরং এক শ্রেণির লোকের কাছে তিনি জাতির পিতার মর্যাদা রাখেন!

কিন্তু আমাদের রায় হলো, মুজিবের ব্যাপারে এই সমস্ত খামখেয়ালিমূলক বক্তব্য তার ভূমিকা পুরোপুরিভাবে বর্ণনা করতে পারে না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুজিব একজন জালিম তাগুত ছিলো। বাংলাদেশের ক্ষমতার মসনদে বসে ‘মানব রচিত আইন ও দৃষ্টিভঙ্গি’র উপর ভিত্তি করে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সে এবং তার দল দেশে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য বিস্তার করেছিলো। কিন্তু এটাও সত্য যে, ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সে সবদিক থেকেই বাংলাদেশের জনপ্রিয় নেতা ছিলো। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত হওয়ার অনেক আগেই পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তাকে নিজেদের নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছিলো।

পাকিস্তান বিভক্তির পেছনে একমাত্র মুজিবুর রহমানের হাত ছিলো বা তিনি এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অপরাধী ছিলেন – বিষয়টা এমন নয়। যদিও তিনি উল্লেখযোগ্য অনেক ভূমিকাই পালন করেছিলেন, একথা সত্য। অপরাপর রাজনীতিবিদদের মতো মুজিবুর রহমানেরও শক্তি ও ক্ষমতার লালসা ছিলো। তার ভূমিকা একই সময়ে ধোঁয়াশাচ্ছন্ন,

দ্বিমুখী, স্বেচ্ছাচারিতার শিকার এবং মেকিয়াভেলি নীতি আশ্রিত

1 ছিলো।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, তিনি ক্ষমতার জন্য অহঙ্কারী প্রতিক্রিয়াশীল স্বভাবের পাকিস্তানি জেনারেলদের খুশি রাখার চেষ্টা করেছেন। একই সময়ে নিজের দলের বাঙালি জাতীয়তা পূজারি এবং স্বাধীনতাকামী সকলকেই খুশি রাখতে চেষ্টা করেছেন। তিনি পরস্পর বিরোধী গুণাগুণের অধিকারী ছিলেন।

মুজিবুর রহমান প্রধানত একজন পদলোভী রাজনীতিবিদ ছিলেন। এ কারণে ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ১০ বছর সময়ের মধ্যে আমরা তার মাঝে পরস্পর বিরোধী প্রবণতা দেখতে পাই। একদিকে ষাটের দশকের শুরুতে পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ার জন্য তাকে পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র করতে দেখা যায়। অপরদিকে ১৯৬৯ সালের পর তাকে ভিন্ন ধরনের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

মুজিব.. একজন গাদ্দার ও বিশ্বাসঘাতক

ভারতের একজন বাঙালি লেখক মনোজ বাসুকি'র বর্ণনা মতে –

1 ইটালিয়ান রাজনীতিবিদ এবং সাহিত্যিক নিকোলা মেকিয়াভেলির দিকে সম্বন্ধ করে বলা হয় মেকিয়াভেলি- নীতি। মেকিয়াভেলি রাজনীতি ও ক্ষমতার জন্য যেকোনো ধরনের বৈধ অবৈধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা উপযুক্ত মনে করতেন।

১৯৫৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান তাকে বেইজিং- এ একথা বলেন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করেই ছাড়বেন।

2 ১৯৭২
সালে কলকাতায় দ্বিতীয়বার যখন তাদের সাক্ষাৎ হয়, তখনও মুজিব মনোজ বাসুকে বেইজিং-এ বলা কথাটা স্মরণ করিয়ে দেন

3।
কিন্তু এখানে পাঠকদের কাছে এ কথা বলে রাখা জরুরি মনে করছি যে, ঐ সময়টার (৫৬ থেকে ৮২ সালের মধ্যে) আরও কিছু বাঙালি রাজনীতিবিদের মাঝে এই (পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন করার) দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল ছিলো। পূর্বের আলোচনায়

4 আমরা তার কিছু উদাহরণ উল্লেখ
করেছি।

১৯৬৩ সালে মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের সাহায্যে পাকিস্তানের বাম বাহু থেকে আলাদা করার ইচ্ছায়, ভারতের আগরতলায় এক গোপন বৈঠকে যোগদান করেন। মুজিবের ভাতিজা শেখ শহীদুল ইসলামের বর্ণনা মতে, মুজিবুর রহমানের সাথে আলী রেজাও ওই ষড়যন্ত্রে অংশীদার ছিলেন। শচীন্দ্র লাল সিং – ঐ সময় ভারতের

2 তাজ হাশমি রচিত Fifty years of Bangladesh, 1971—2021: Crises of culture, development, Governance and Identity, 3 মাহফুজ আল বারী রচিত ‘এক অভিযুক্তের বয়ানে আগরতলা মামলা’
4 ঢাকার পতনের জন্য দায়ী কে? – উস্তাদ আবু আনওয়ার আল হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ
লিঙ্ক - https://gazwah.net/?p=41577

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক ফয়েজ আহমদকে ১৯৯১ সালে দিল্লিতে একটি স্বাক্ষরকৃত পত্র দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন:

“১৯৬৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ১০ জন সদস্য সহ আগরতলায় আমার বাংলোয় আসেন। মুজিব ভাইয়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কিন্তু তিনি মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে আবেদনকৃত ত্রিপুরা থেকে কোন রকমের প্রোপাগান্ডা পরিচালনার অনুমতি দিতে অসম্মতি জানান। তার কারণ ছিলো: চীনের সঙ্গে যুদ্ধের পর তিনি (নেহেরু) এত বড় ঝুঁকি নিতে তৈরি ছিলেন না। এ কারণে ১৫ দিন অবস্থানের পর তিনি (মুজিব) ত্রিপুরা থেকে চলে যান

5।

এ সমস্ত দলীল থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ১৯৬৩ সালে মুজিব ভারতের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে বিভক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নেহেরু এই পরিকল্পনার মাঝে ঝুঁকি অনুভব করেন। মুজিবকে সামাজিক ও সামরিক সাহায্য না দেয়ার বিষয়টি মুজিবের পরিকল্পনা পাল্টে দেয়।

5 বদরুদ্দীন ওমর রচিত ‘the Emergence of Bangladesh, volume 2, rise of Bengali Nationalism

এরপরও মুজিব স্থানীয় বিভক্তিকামী হিন্দুদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। মুজিব বিশেষ করে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। চিত্তরঞ্জনের ইচ্ছা ছিলো: পূর্ব পাকিস্তানের চারটি অথবা পাঁচটি জেলাকে স্বাধীন বঙ্গভূমি (অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসিত হিন্দু এলাকা) হিসেবে স্বাধীন করা। এখানেই শেষ নয়; বরং মুজিব ঢাকায় অবস্থানকারী ভারতীয় কিছু শিল্প উদ্যোক্তা এবং ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গেও যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন।

এ সমস্ত বাস্তবতা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই কাহিনীর অপর একটা দিকও রয়েছে।

মুজিব একজন স্বদেশপ্রেমী

বলা হয়, ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য বাঙালী দলগুলোর পক্ষ থেকে উপস্থাপিত ‘ছয় দফা দাবি’ মৌলিকভাবে দেশ বিভাগের জন্য ছিলো না। আইয়ুব খান এবং ভুট্টোসহ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সকল রাজনৈতিক নেতা দাবিগুলোর অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রান্বেষণ করতে গিয়ে সেটাকে ‘জাতিবিরোধী’, ‘বিদ্রোহাত্মক’ এবং ‘দেশ বিভাগে উদ্বুদ্ধকারী’ বলে আখ্যা দেয়। বিপরীতে মুজিব সর্বদাই দাবি করে এসেছেন, ঐ ছয় দফা দাবি মূলগতভাবে দেশ বিভক্তির

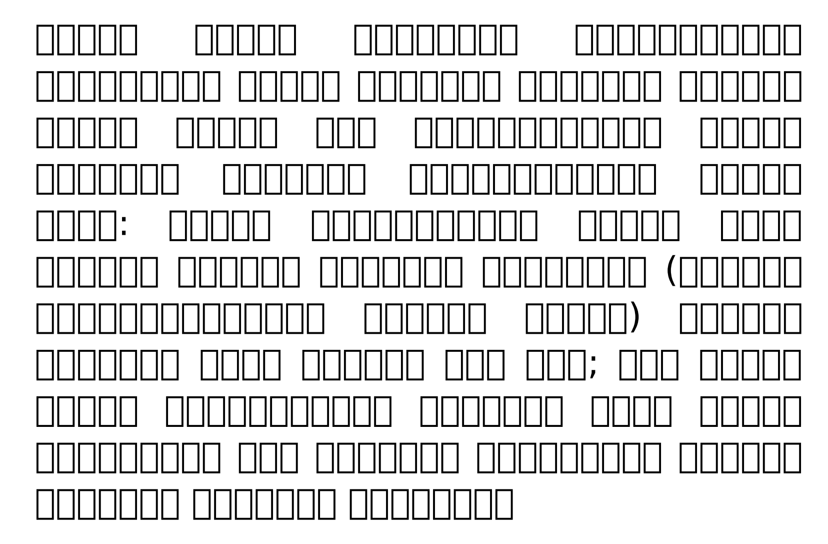

জন্য নয়। ছয় দফার দাবিগুলো মূলত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের জন্য এবং ‘হুমকি’ হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছিলো।

১৯৬৬ সালের মে মাসে সরকার মুজিবকে এই ‘বিভক্তিমূলক’ ছয় দফা দাবির কারণে গ্রেপ্তার করে। কিছুদিন পরেই ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা’য় মুজিব অভিযুক্ত হন। ফলে ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে শেখ মুজিব বেশ কয়েকবার জেলে যান। ৫৮ থেকে শুরু করে ৬৯ এর ২২শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মুজিব দীর্ঘ সময় জেলে অতিবাহিত করেন। কয়েকবার অল্পদিনের জন্য এবং কয়েকবার বছরখানেক সময়ের জন্য।

কিন্তু মুজিবের ছয় দফা দাবির বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের এই ছিদ্রান্বেষণ ও হিংসাত্মক আচরণ পরিশেষে তাদের আশা- আকাঙ্ক্ষার বিপরীত ফল নিয়ে আসে। সরকারের প্রতিশোধপরায়ণ আচরণ মুজিবকে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তুলে।

১৯৬৯ সালের সূচনাকালে ১৭ই জানুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একটা আন্দোলন শুরু করে। তারা মুজিবের উপর থেকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানায়। আন্দোলনের ফলে পরিশেষে আইয়ুব খান শেখ মুজিবুর রহমান সহ উক্ত

মামলায় অভিযুক্ত সকলকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

মুক্তি লাভের পর শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান বিভক্তি অথবা স্বাধীন বাংলাদেশের ব্যাপারে কোন কথা বলেননি। বরং বিপরীত ঘটনা ঘটে। ১৯৬৯ সালের ১৩ই মার্চ, ইসলামাবাদে আয়োজিত ব্যক্তিগত এক নৈশভোজে মুজিব আইয়ুব খানকে ব্যক্তিগতভাবে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন যে, তার ৬ দফা দাবি পাকিস্তানকে সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সহায়ক বলেই প্রমাণিত হবে। একথায় মুজিব আইয়ুব খানকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করেন। মুজিবের সহকারী মওদুদ আহমদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উনি পরবর্তীতে বলেছিলেন, “এই আয়োজনের পর মুজিবকে অনেক আনন্দিত ও আশ্বস্ত বলে মনে হচ্ছিলো। তার ধারণা ছিলো - সেনাবাহিনী এ বিষয়ের স্পর্শকাতরতা, নাজুকতা ও ওজন পরিমাপ করতে পেরেছে। তারা ভবিষ্যতে পাকিস্তানের বিভক্তিরোধ ও সংহতি-রক্ষা করতে জনসাধারণের সম্মতির বিষয়ে গুরুত্ব দিবে। শক্তি প্রয়োগ করে কিছু করতে যাবে না

6।

ইসলামাবাদ থেকে মুজিবের পূর্ব পাকিস্তানের ফেরার পরপরই আওয়ামীলীগ ১৯৬২ সালের সংবিধানের সংশোধনী বিলের খসড়া তৈরি করে। সেখানে অন্যান্য বিষয়ের

6 মওদুদ আহমদ রচিত ‘Bangladesh Constitutional Quest for Autonomy’

পাশাপাশি নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলোর ব্যাপারে সকলেই একমত হয়:

রাষ্ট্রের নাম ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান বহাল রাখা হবে।

রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য মুসলিম হওয়ার শর্তও বহাল রাখা হবে, যেমনটা ১৯৬২ সালের সংবিধানে করা হয়েছে।

পুরো দেশে একই কারেন্সি জারি রাখা হবে।

7

খসড়ায় সেকুলারিজম অথবা দেশ বিভক্তির ব্যাপারে কোন পয়েন্ট অন্তর্ভুক্ত ছিলো না।

এরপর মুজিব ইয়াহিয়া খানের লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার (যেখানে পাকিস্তানকে অবিভক্ত রাখার নীতিমালা ছিলো) মেনে চলার ওয়াদা করেন এবং ১৯৭০ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেন, যেন আইনের খসড়া তৈরি করা যায়।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে, নির্বাচনী প্রচারণাকালেও মুজিব অথবা আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের স্বাধীনতার কোন কথা উঠায়নি। তাই মুজিবের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিলো - পাকিস্তানকে বিভক্ত করা এবং মুজিবের ছয় দফা দাবির কারণেই পাকিস্তান বিভক্ত হয়েছিলো - এ ধরনের দাবি সঠিক নয়।

7 মওদুদ আহমদ রচিত ‘Bangladesh Constitutional Quest for Autonomy’

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভোট পেয়ে ভূমিধ্বস বিজয় অর্জন করে। একই সময়ে মুজিব অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। যদিও তিনি ১৯৬০ এর দশকের শুরুর দিকে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী অবস্থা থেকে বোঝা যায় যে, ১৯৬৩ সালে নেহেরুর অসম্মতি মুজিবকে নিজের চিন্তা পরিবর্তন করতে বাধ্য করেছিলো। অতঃপর ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের পুরোপুরি স্বাধীনতার ব্যাপারেও মুজিবের অবস্থান নমনীয় ছিলো।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনে জয়লাভের পর মুজিব পশ্চিম পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহের মতো কঠিন পথ অবলম্বন করবেন - এমন কোন প্রয়োজনই আর ছিলো না। তার পক্ষে তখন পাকিস্তানের আগামী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রত্যাশা করার বহু কারণ উপস্থিত ছিলো। বরাবরই পদলোভী মজিবুর রহমানের সমস্ত প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু ছিলো নিজেকে অবিভক্ত পাকিস্তানের আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখা। অতঃপর রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের পর ১৯৭১ সালে

ঢাকায় অনুষ্ঠিত তার প্রথম জনসভায় মুজিবুর রহমানকে ‘পাকিস্তানের আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী’ বলে অভিহিত করেন।

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটি গোপন নথিপত্রে এই আভাস পাওয়া যায় যে, মুজিব এবং ইয়াহিয়া খানের মাঝে একটি চুক্তি হয়েছিলো। সেই চুক্তি অনুযায়ী ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি এবং মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন

8।
তাদের উভয়ের মাঝে বোঝাপড়া এতটা ভালো ছিলো যে, মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারে ইয়াহিয়া খানকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে বহাল রাখতে চাইতেন। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, আর্চার কেন্ট ব্লাড (১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান মার্কিন দূতাবাসের কনসাল জেনারেল) ১৯৭১ সালের ২৯ শে জানুয়ারিতে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টকে প্রেরিত তার এক দীর্ঘ গোপন চিঠিতে লিখেছেন: “আওয়ামী লীগ সরকারের পরিচালনা পর্ষদের তালিকায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ নির্বাহী পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর অধিকারী হবেন:-

প্রধানমন্ত্রী: শেখ মুজিবুর রহমান

8

Department of State, Airgram, Confidential, From Archer Blood, US Consul General, Dacca, January 29, 1971, The American Papers: Secret and Confidential, India-Pakistan-Bangladesh Documents 1965–1973, Compiled and Selected by Roedad Khan

রাষ্ট্রপতি: এ এম ইয়াহিয়া খান

ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি স্পিকার: জহির উদ্দিন আহমদ (আওয়ামী লীগ এম এন এ)

পররাষ্ট্রমন্ত্রী: ডক্টর কামাল হুসাইন (আওয়ামী লীগ এমএনএ)

মূল মন্ত্রণালয়: সাইয়েদ নজরুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ এম এন এ)

অর্থমন্ত্রী/অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রধান: রহমান সোবাহান (ঢাকা ইউনিভার্সিটির বামপন্থী দক্ষ অর্থনীতিবিদ)

বাণিজ্যমন্ত্রী: মতিউর রহমান অথবা এম আর সিদ্দিকী (উভয়ই আওয়ামী লীগের এম এন এ)”9

এসমস্ত পদে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছিলো জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং ওই সমস্ত পাকিস্তানি জেনারেলরা, যারা ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অথবা অন্য যেকোনো সময়ে মুজিবকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাইছিলো না। তাদের জন্য এটা কল্পনা করাই অসম্ভব ছিলো যে, একজন বাঙালি পাকিস্তানের লিডার হয়ে যাবে!

9

Department of State, Airgram, Confidential, From Archer Blood, US Consul General, Dacca, January 29, 1971, The American Papers: Secret and Confidential, India-Pakistan-Bangladesh Documents 1965–1973, Compiled and Selected by Roedad Khan

১৯৭১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারিতে ইয়াহিয়া খান, জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস পার্টির চাপে মার্চ মাসে অনুষ্ঠেয় ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি মিটিং মুলতবি ঘোষণা করেন। এই মিটিং স্থগিত করার উদ্দেশ্য ছিলো - মুজিব এবং ভুট্টোকে যেন পাকিস্তান সরকারের রূপরেখা প্রণয়নের জন্য একক কোন সিদ্ধান্তের উপর নিয়ে আসা যায়।

১লা মার্চ ইয়াহিয়ার ভাষণের পর ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে মুজিবের উপর চাপ প্রয়োগ করা হয়, তিনি যেন স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দেন। কিন্তু একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, স্বায়ত্তশাসিত বাংলাদেশের দাবি তোলার পরিবর্তে মুজিব ইয়াহিয়ার কাছে নিম্নোক্ত চারটি শর্ত পূরণ করার দাবি জানান:

১. তাৎক্ষণিকভাবে মার্শাল ল' এর পরিসমাপ্তি।

২. সেনাবাহিনীর ব্যারাকে ফিরে যাওয়া।

৩. সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের কারণে জানের ক্ষয়ক্ষতিগুলোর ন্যায়পূর্ণ তদন্ত।

৪. তাৎক্ষণিকভাবে (মুজিবের কাছে) ক্ষমতা হস্তান্তর।

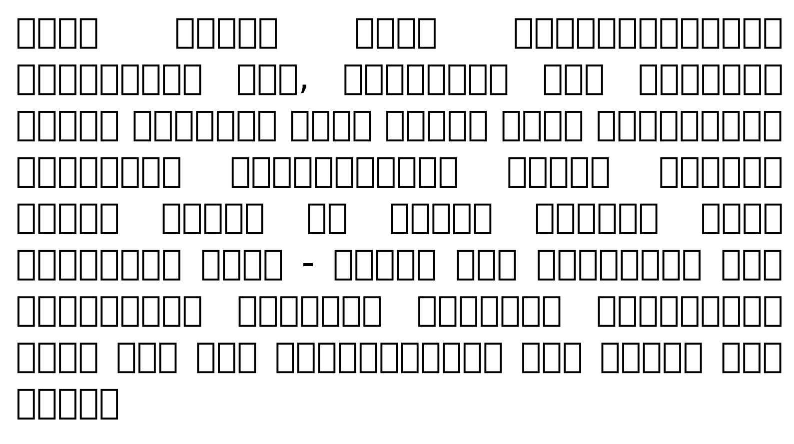

অর্থাৎ এসেম্বলি অনুষ্ঠান এবং আইনি রূপরেখা তৈরি করার আগেই (এই সমস্ত শর্ত যেন পূরণ করা হয়)

10

এসব ছাড়াও আরও অনেক প্রমাণ রয়েছে, যেগুলোর দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, সে সময়টাতে মুজিবের লক্ষ্য উদ্দেশ্য পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করা ছিলো না। বরং অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়াই তার উদ্দেশ্য ছিলো। এখন তাহলে ওই সমস্ত প্রমাণাদির ওপর একটু দৃষ্টি বুলিয়ে আসা যাক!

রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান যে ভাষণে ন্যাশনাল এসেম্বলির প্রথম সেশন মূলতবি করার ঘোষণা দেন, তা পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র প্রচণ্ড জনরোষ ও বিক্ষুব্ধ গণপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ১৯৭১ সালের ৭ ই মার্চের মুজিবের ভাষণ ছিলো তারই ফল ও প্রতিক্রিয়ামূলক অভিব্যক্তি। যদিও এই ভাষণে অনেক অস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিলো, তা সত্ত্বেও স্বাধীনতা ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা এই ভাষণে ছিলো না।

৭ই মার্চ মুজিব ইয়াহিয়া সরকারের বিরুদ্ধে একটি শান্তিপূর্ণ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। তার ভাষ্য এমন ছিলো:

“এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”

10 G.W Chaudhury রচিত The Last Days of United Pakistan

এরপর মুজিব ৭ই মার্চের ভাষণের শেষে দুটো স্লোগান উচ্চারণ করেন:

“জয় বাংলা এবং জয় পাকিস্তান।”

এ কথার সত্যায়ন ও সমর্থন অনেকেই করেছেন। তাদের মাঝে রয়েছেন: এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার, কবি শামসুর রাহমান, সাংবাদিক নির্মল সেন, ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী এবং আরও কতক ব্যক্তি। বাস্তবতা হলো মুজিবুর রহমান তার ভাষণ শেষ করেছেন পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ উভয় অঞ্চলের জয়-জাগরণের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে

11।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে মুজিব পাকিস্তানে অবস্থানরত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ডের কাছে আবেদন করেন, তিনি যেন নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ইয়াহিয়া খানকে চাপ প্রয়োগ করেন। যদি এটা সম্ভব না হয়, তাহলে যেন দলে থাকা বিভক্তিকামীদের থেকে তাকে (অর্থাৎ মুজিবকে) বাঁচানোর জন্য নিজের হেফাযতে নিয়ে নেন। এসময় মুজিব নিজ জীবনের আশঙ্কায় ছিলেন।

বলা হয় - মুজিব মার্চের শুরুর দিকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ডকে

11 এ.কে খন্দকার রচিত ‘১৯৭১: ভেতরে বাইরে’, প্রথমা প্রকাশন এবং জাফরুল্লাহ চৌধুরী রচিত ‘৭ মার্চের ভাষণ এবং সিরাজুল আলম খান’, (বাংলা দৈনিক পত্রিকা, নয়া দিগন্ত ৭ এপ্রিল ২০১৮ ইং)

বলেন যে, তিনি একটি স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত বাংলাদেশ বানাতে চান না। বরং তিনি বাঙালিদের সম্মানজনক অংশগ্রহণে একটি ‘ফেডারেশন অফ পাকিস্তান’ বানাতে চান, যেখানে বাঙালিরা অন্যান্য প্রদেশের নাগরিকদের মতই সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকবে। বাঙালিরা কোনরকম কলোনি অথবা নয়া উপনিবেশে শাসিত জনগণের মতো জীবন যাপন চায় না

12।

এমনকি ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানের দিক থেকে ভয়ানক পাশবিক সেনা অ্যাকশনের সময়তেও মুজিবের পক্ষ থেকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ব্যাপারে মিশ্রিত ও বহুমুখী চিন্তাভাবনার আভাস পাওয়া যাচ্ছিলো। মুজিব ২৪শে মার্চ প্রেসকে দেয়া বক্তব্যে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা (যা শেখ মুজিব ইয়াহিয়া এবং ভুট্টোর মাঝে চলমান ছিলো) ও আলাপচারিতার অগ্রগতির ব্যাপারে আশা ব্যক্ত করেন। আলোচনায় মুজিব যথেষ্ট আন্তরিকতা প্রদর্শন করেন এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের হাত থেকে ক্ষমতা সিভিল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান বের হওয়ার আশা ব্যক্ত করেন। এসকল কর্মকাণ্ড, সে সময়কার বহুমুখী প্রবণতারই প্রমাণ বহন করে। শেখ মুজিব তখনও আশা রেখেছিলেন যে, তিনি

12 G.W Chaudhury রচিত The Last Days of United Pakistan

অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে সফল হবেন।

অন্যদিকে একই সময়ে নিজের কাছের লোকদেরকে ঢাকা থেকে বের হতে বলেন। এছাড়া একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা করতে অস্বীকার করেন। সম্ভাবনার ভিত্তিতে তিনি তখনও এটাই চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন যে, ইসলামাবাদের সঙ্গে অবিভক্ত পাকিস্তানের অধীনে উভয় অঙ্গের মাঝে কোন বোঝাপড়ায় আসা সম্ভব হয় কি না।

এমনকি মুজিব তাজউদ্দীন আহমাদের তৈরিকৃত খসড়াতে দস্তখত করতে অস্বীকার করেন। ২৫শে মার্চে স্বাধীনতার ঘোষণা রেকর্ড করাতেও অসম্মতি জানান। কারণ পাকিস্তানের দিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতার মামলা আরোপের ভয় ছিলো মুজিবের। তাজউদ্দীন স্বাধীনতার ঘোষণার উপর স্বাক্ষর করতে অথবা স্বাধীনতার ঘোষণার রেকর্ড করার দাবি জানান মুজিবের কাছে। মুজিবকে তার সঙ্গে কোন নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার কথা বলেন তাজউদ্দীন। কিন্তু মুজিব পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, “ঘরে গিয়ে আরাম করে ঘুমাও। আমি ২৭শে মার্চে ব্যাপক হরতালের ঘোষণা করে দিয়েছি

13।”

মজার বিষয় হলো: বলা হয় যে, মুজিব বাংলাদেশ বানাবার অভিযোগ তাজউদ্দিনের

13 শারমিন আহমদ রচিত ‘তাজউদ্দীন আহমেদ: নেতা ও পিতা’

উপর আরোপ করেন। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি তারিখে পাকিস্তান থেকে ঢাকা এয়ারপোর্টে পৌঁছার পরপরই মুজিবুর রহমান তাজউদ্দীনকে বলেন:

“তাজউদ্দীন! অবশেষে তোমরা পাকিস্তান ভেঙেই দিলে!

14

”

মেজর জেনারেল খাদেম হোসাইন রাজা, (যিনি সেসময় পূর্ব পাকিস্তানের জেনারেল অফিসার কমান্ড ছিলেন) তিনিও এই মত পোষণ করেন যে, ‘একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পক্ষে মুজিব ছিলেন না’।

মুজিব মেজর জেনারেল রাজা (জিওসি, ১৪ তম ডিভিশন, পাকিস্তান আর্মি, ঢাকা) -এর কাছে মার্চের ছয় অথবা সাত তারিখে এই আবেদন সহকারে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন যে, তার প্রাণ রক্ষার জন্য তাকে যেন নিরাপত্তা হেফাযতে নিয়ে নেয়া হয়। খাদেম হুসাইন রাজা লিখেন:

“মার্চের ছয় তারিখ শেষ বেলায় একজন বাঙালি ভদ্রলোক আমার গৃহে তাশরীফ আনেন এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন করেন। বলেন যে, তিনি মুজিবের আস্থাভাজন ও কাছের একজন মানুষ। মুজিব তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন একটি বিষয়ে আবেদন করার জন্য। শেখ মুজিবের বার্তা সংক্ষেপে ছিলো এই,

14 আর চৌধুরী রচিত Bangladesh: Sheikh Mujib’s Stance on “Independent Bangladesh”: Sensational Revelations

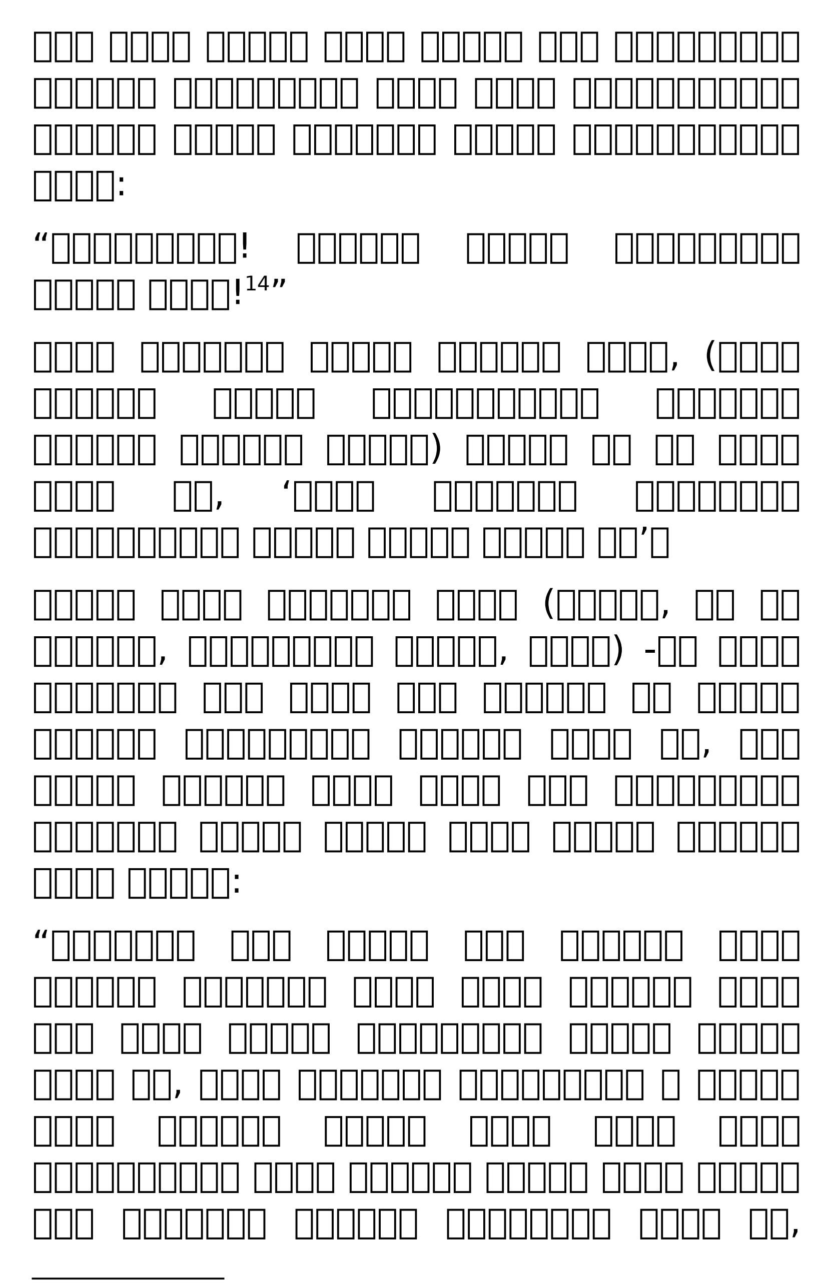

তিনি তার দলের কট্টরপন্থী ও ছাত্রনেতাদের পক্ষ থেকে তীব্র চাপের শিকার। তাদের দাবি ছিলো, মার্চের ৭ তারিখের জনসভায় যেন স্বাধীনতার একতরফা ঘোষণা করে দেয়া হয়। শেখ মুজিবের দাবি ছিলো, তিনি একজন স্বদেশপ্রেমী; পাকিস্তান বিভক্তির কোন কার্যক্রমে তিনি যুক্ত হতে চান না। এ কারণে তিনি চান, আমি (খাদেম হুসাইন রাজা) তাকে যেন নিরাপত্তা হেফাযতে নিয়ে নেই এবং ক্যান্টনমেন্টের সীমানায় তাকে আটকে রাখি। তাকে ধানমন্ডিতে তার আবাসস্থল থেকে নেয়ার জন্য যেন সেনাবাহিনীর একটি দল প্রেরণ করি, মুজিব তারও আহ্বান জানান

15

”।

কিন্তু মুজিবের এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। জেনারেল রাজার বক্তব্য অনুযায়ী শেখ মুজিব হার মানেননি। তিনি মার্চের ৭ তারিখ রাত দুইটা বাজে পুনরায় দুজন প্রতিনিধি পাঠান, যারা পুনরায় একই আবেদন পেশ করে। মুজিব পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা হেফাযতে আসতে চাচ্ছিলেন। মুজিবের এই ইচ্ছা সম্পর্কে পাক বাহিনীর অপর এক অফিসার সত্যায়ন করেন। এই অফিসার জেনারেল রাজা এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ডের বক্তব্যগুলোও সত্যায়ন করেন

16।

15 মেজর জেনারেল (রিটায়ার্ড) খাদেম হোসাইন রাজা রচিত A Stranger in My Own Country, East Pakistan, 1969-1971 16 সিদ্দিক সালেক রচিত ‘আমি ঢাকা ডুবতে দেখেছি’

পাকিস্তানি একজন গোপন পুলিশ ইন্সপেক্টর ‘রাজা আনার খান’। তিনি মুজিবের পাকিস্তানের গ্রেফতারির দিনগুলোতে তার বাবুর্চি এবং ব্যক্তিগত সেবকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তার থেকে মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যকার আলোচনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী জানা যায়।

বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার কিছুদিন পরেই ভুট্টো মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তখন মুজিব তার গ্রেফতারির সময়টাতে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে একেবারেই বেখবর ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২০ শে ডিসেম্বর মুজিব ভুট্টোর এই বক্তব্য শোনেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের পতন এবং ভারতের সামনে অস্ত্র সমর্পণের পরে তিনি (অর্থাৎ ভুট্টো) পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি এবং চিফ মাস্টার ল' এডমিনিস্ট্রেটর হয়ে গিয়েছেন। এই বক্তব্যে মুজিব দিশেহারা হয়ে যান এবং বলেন:

“তুমি কিভাবে প্রধানমন্ত্রী হতে পারো? সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দলের নেতা হওয়ার দিক থেকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার অধিকার আমার; তোমার নয়। আমাকে এখনই কোন রেডিও অথবা টেলিভিশন স্টেশনে নিয়ে চলো! আমি পূর্ব পাকিস্তানকে (পূর্বের অবস্থায়) বহাল করবো এবং সবকিছু ঠিক করে নেব ...[17]।

[17] দুনিয়া নিউজ, দৃষ্টিভঙ্গি শীর্ষক টকশো (دنیا نیوز ٹاک شو ’نقطہ نظر), ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ ইং

এ সমস্ত তথ্য উপাত্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে, একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত পূর্ব বাংলা অথবা বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটানোর জন্য আওয়ামী লীগের বিভক্তিকামী নেতা, নীতি- নির্ধারক ও ছাত্র লিডাররা দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এই সংগ্রামে সাহায্য সহযোগিতা করার চেয়ে একটি অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের আগ্রহ ও ব্যাকুলতা বেশি ছিলো। মুজিব ছাড়াও এই খেলায় আরও অনেক প্লেয়ারের উপস্থিতি ছিলো। তারা খেলার রূপ আগাগোড়া রদবদল করে দিয়েছিলো।

সিরাজ এবং নিউক্লিয়াস সেল

মুজিবুর রহমানের বন্দী দশা ও গ্রেপ্তারির সময়ে (১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত) বাঙালি যুবক ও শিক্ষার্থীরা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনের উপর বাস্তবিক অর্থেই পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করে নিয়েছিলো। ১৯৬৯ সালে সিরাজুল আলম খান, এ এস এম আব্দুর রব এবং আরও কিছু লোকের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ছাত্র উইং এর বামপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনকারী এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সহায়তাকারী যুবকদের খুবই ধারালো ও অ্যাকটিভ অংশ - ছাত্রলীগের সদস্যদের

অধিকাংশকেই প্রভাবিত করে ফেলতে সক্ষম হয়। সে সময় শেখ মুজিব জেলে ছিলেন। এই ছাত্র নেতারা একটি পূর্ণাঙ্গ, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্য শুধু জনসমর্থন ও সহায়তা অর্জন করতেই সফল হয়নি; বরং পুরোদস্তর একটি সুশৃঙ্খল ও কার্যকরী আন্দোলন সংগঠিত করে ফেলে। ১৯৬৯ সালের শুরুর দিক থেকেই তারা পূর্ব পাকিস্তান এবং অন্য শব্দে বললে ‘বাংলাদেশের’ জন্য জনসমক্ষে প্রকাশ্যে স্বাধীনতার দাবি তুলতে আরম্ভ করে। ১৯৭০ সালের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভূমিধ্বস বিজয়ের ক্ষেত্রেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলো।

এই পরিস্থিতি তৈরি করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন - গোপন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ‘সিরাজুল আলম খান’। সিরাজ একজন পাক্কা লেফটিস্ট তথা বামপন্থী ছিলেন। তিনি ইচ্ছাকৃত জনগণের মনোযোগ ও দৃষ্টি থেকে দূরে থাকতেন। তিনি দ্রুতই মুজিবের সাহায্যকারী ‘ছাত্রলীগ’ এর সেরা নেতৃবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। অন্যান্য ছাত্র নেতারা তাকে ‘দাদা’ অথবা ‘বড় ভাই’ বলে অভিহিত করতে আরম্ভ করে।

ছাত্রলীগের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং মুজিবের কাছের মানুষ ও আস্থাভাজন হওয়া সত্ত্বেও সিরাজ ‘নিউক্লিয়াস’ নামক একটি

গোপন সেল খুলেছিলেন। '৬০ এর দশকের শুরু থেকেই এই নিউক্লিয়াস গোপনভাবে বাঙালি ছাত্রদেরকে ভর্তি করতো। তাদের চিন্তাগত কাঠামো বিনির্মাণ করতো এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিভক্তি মূলক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে তৈরি করতো। ১৯৬৯ সালের কাছাকাছি সময়ে ‘নিউক্লিয়াস’ সেলের নেতারা কট্টরপন্থী বাঙালি জাতীয়তাবাদী এবং কথিত বিজ্ঞানবাদী সোশ্যালিজমের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো সমর্থন করতে আরম্ভ করে।

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইন তৈরি করা, এই পতাকা সর্বপ্রথম উত্তোলন করা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আমার সোনার বাংলা’ সংগীতকে জাতীয় সংগীত হিসেবে নির্ধারণ করা এবং ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ এর পরিবর্তে ‘জয় বাংলা’র স্লোগান দেয়া - সবই করেছিলো এই নিউক্লিয়াস সেল। যুদ্ধ চলাকালে সিরাজ এবং তার সঙ্গী ভারত সরকার ও জেনারেলদের খুবই কাছাকাছি ছিলেন। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্য থেকে বেছে বেছে সদস্য তৈরি করতো যাদেরকে পরবর্তীতে মুজিব বাহিনীর নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে নিয়োগ করা হতো

18।

18 ‘মুজিব বাহিনী’ হল বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদেরকে নিয়ে গঠিত একটি বিশেষ দল। বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদেরকে নির্মূলকর্মে দক্ষ ভারতীয় র' সংস্থার মেজর জেনারেল সুজন সিং আবানের নেতৃত্বে এই

ভারতীয় এজেন্ট চিত্তরঞ্জন যার আলোচনা পূর্বে গিয়েছে, তার সঙ্গেও সিরাজের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরেও সিরাজ প্রায়ই চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কলকাতায় যেতেন এবং তার কাছে অবস্থান করতেন। ১৯৭৫ সালের যেই দিনে মুজিবকে হত্যা করা হয়, সেদিনও সিরাজ চিত্তরঞ্জনের কলকাতার আবাসস্থলে অবস্থানরত ছিলেন। সিরাজ স্বীকার করেন, ১৯৭০ সালের শুরুর দিকে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার আগে নিউক্লিয়াসের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুজিব অবহিত ছিলেন না। তার চেয়ে বড় কথা, সিরাজ একথা বলেন যে, ‘মুজিব জয় বাংলার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং

বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। আবান বাঙালি সিরাজুল আলম খান, (মুজিবের ভাগিনা) শেখ ফজলুল হক মনি এবং তোফায়েল আহমদের সাহায্য ও সহায়তায় দলটি গঠন করেন। (স্বাধীনতার সংগ্রামী দলকে বাঙালি লিবারেশন ফোর্স নামেও ডাকা হতো)। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামীদের চীফ জেনারেল এম এ জি ওসমানী এই গ্রুপ গঠন এবং এর লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ব্যাপারে অবগত ছিলেন না। মুজিব বাহিনী ১৯৭১ সালের জুনে ভারতে গঠিত হয়। গ্রুপটির মজবুত রাজনৈতিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল। গ্রুপটি পুরোপুরিভাবে বিশ্বস্ততা ও অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে মুজিব কেন্দ্রিক ছিল। বাংলাদেশী স্বাধীনতাকামীদের মাঝে মুজিব বিরোধীদেরকে চিহ্নিত করার জন্য জেনারেল আবান এই গ্রুপটি গঠন করেন। আরও বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নোক্ত রেফারেন্স দ্রষ্টব্য:
মেজর জেনারেল সুরুর হোসাইন রচিত The irregular forces of Bangladesh Liberation War”, Daily Star, March, 26,2020

বাংলাদেশের জন্য একটি জাতীয় পতাকা তৈরির ব্যাপারেও তার আপত্তি ছিলো’

19।

যা হোক সিরাজ এবং তার কট্টরপন্থী জাতীয়তাবাদী সোশ্যালিস্টদের মতের আধিক্যের ভিত্তিতে মুজিবের চিন্তা চাপা পড়ে যায়। তবে মুজিব তাদের চাপের মধ্যে না এসে নিজ সিদ্ধান্তে স্থির থাকেন এবং স্বাধীনতার একতরফা ঘোষণা থেকে বিরত থাকতে সফল হন। বাস্তবিক পক্ষে তিনি নিজের মেধা দিয়ে এই সব কিছু জয় করেন।

মুজিব লোকদেরকে সে কথা শোনাতে পারদর্শী ছিলেন, যা লোকেরা তার কাছ থেকে শুনতে চাইতো অথবা শোনার আশা রাখতো। পাকিস্তান বিভক্তির বিরুদ্ধে থাকা পাকিস্তানিদের সামনে তিনি নিজেকে বিশ্বস্ত ও স্বদেশপ্রেমী পাকিস্তানি হিসেবে উপস্থাপন করতেন। একই সময়ে নিজের দলের বাংলাদেশ সমর্থক কট্টরপন্থীদের সামনে তিনি নিজেকে প্রায়ই একজন কট্টর বাঙালি জাতীয়তাবাদীর ভূমিকায় উপস্থাপন করতেন।

ভুট্টোর ভূমিকা

১৯৭১ সালের ঘটনাবলীর জন্য দায়ী ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। তিনি একজন অগ্রণী

19 সিরাজুল আলম খান, আমি সিরাজুল আলম খান: একটি রাজনৈতিক জীবনালেখ্য, সংকলন ও রচনা: শামসুদ্দিন পেয়ারা।

ভূমিকা পালনকারী ছিলেন, যিনি সকল কিছুর কলকাঠি নাড়াচ্ছিলেন। লেখকের রায় অনুযায়ী - ঢাকা পতনের জন্য মুজিবের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি দায় আরোপিত হয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নেতৃবৃন্দ এবং ভুট্টোর ওপর।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ভুট্টোর দল ৮৮টি আসন লাভ করে আর আওয়ামী লীগ লাভ করে ১৬০টি আসন। তা সত্ত্বেও ভুট্টো এবং দখলদার চরিত্রের পাকিস্তানি জেনারেলরা ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অথবা তারও পরের কোন একটা সময়ে মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে। এটাই ছিলো মৌলিক কারণ, যার দরুন উদ্ভূত পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী নিজে থেকেই ভারতের মূল পরিকল্পনা -অর্থাৎ ‘দ্রুত পরিচালিত সামরিক অ্যাকশনের মাধ্যমে পাকিস্তানকে বিভক্ত করে দেয়ার’ পথে অগ্রসর হয়। পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়েই পাকিস্তান ডিসেম্বরের ৩ তারিখে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পরবর্তীতে যা ঘটে তা ইতিহাস।

এসব কারণেই ইয়াহিয়া মুজিব এবং ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত স্থগিত করেন। তিনি চাচ্ছিলেন পাকিস্তানের আগামী সরকার গঠনের জন্য মুজিব এবং ভুট্টোকে যেন একক কোন সিদ্ধান্তের উপর একমত করা যায়। কিন্তু ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি অধিবেশন মুলতবির

সংবাদ ১৯৭১ সালের ১লা মার্চে প্রচারিত হওয়া মাত্রই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে আওয়ামী লীগের ছাত্র ফ্রন্ট ‘ছাত্রলীগ’ রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য বের হয়ে আসে।

১৯৭৮ সালে জিয়াউল হকের উপর থেকে নিজের নজরবন্দী উঠিয়ে নেয়ার উপর ইয়াহিয়া খানের একটি গোপন হলফনামা লাহোর হাইকোর্টে জমা হয়। সেখানে তিনি পাকিস্তান বিভক্তির জন্য মুজিবকে নয় বরং ভুট্টোকে দায়ী সাব্যস্ত করেন। তাতে বলা হয়েছে:

“পাকিস্তান বিভক্তির জন্য মুজিব নয় বরং ভুট্টো দায়ী । ১৯৭১ সালে ভুট্টোর অবস্থান ও বৈষম্যমূলক আচরণ পাকিস্তানের ঐক্যের জন্য শেখ মুজিবের ছয় দফা দাবির চেয়ে বেশি ক্ষতিকর ছিলো। ভুট্টোর পদের লোভ ও অনমনীয় অবস্থানের কারণে পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। বাঙালিদের সাথে তার বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে পাকিস্তানের বিভক্তি রোধ করা সম্ভব হয়নি এবং পূর্ব পাকিস্তান ভেঙে আলাদা হয়ে যায়।

20

ইয়াহিয়া খান তার ওই বক্তব্যে বলেছেন যে, ‘পাকিস্তানি জেনারেলরা তাকে দাবার ঘুঁটির

20 জুনায়েদ আহমদ থেকে প্রাপ্ত Creation of Bangladesh: Myths Exploded (“Affidavit of General (ret) Agha Muhammad Yahya Khan, In The Lahore High Court, Lahore, 29th May 1978”, Annexture-10).

মতো ব্যবহার করেছে।’ ১৯৭১ সালের শুরু থেকে নিয়ে ১৯৭১ এর ডিসেম্বরে ভুট্টোর পক্ষ থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত - ইয়াহিয়া খানের পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ বিষয়ে কারও সাথে সমঝোতামূলক আলাপ আলোচনার কোন সুযোগ ছিলো না ।

শেখ মুজিব পাকিস্তানকে দুই টুকরো হওয়ার পরিণতি থেকে বাঁচাতে এবং পাকিস্তানের বিভক্তি রোধ করতে ব্যর্থ হন। একই সময়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বরাবরের মতো একই অবস্থান ধরে রেখে বিভক্তিকে আরও অগ্রসর করে দেন ভুট্টো। শেখ মুজিব সফল হতে পারেননি। কারণ তিনি তার দলের কট্টরপন্থী যুবকদের শক্তি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। আর ভুট্টো সফল হবার কারণ হলো: সে পাকিস্তানের সেই শাসক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করতো, যাদের বংশগত ও উপনিবেশবাদী চরিত্রের সাথে পাকিস্তান বিভক্তির কৌশলই মানানসই ছিলো। পূর্বের মতোই পাকিস্তান একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকার প্রয়োজন ছিলো, যেখানে পূর্ব পাকিস্তান শুধু একটা বাজার হিসেবে ব্যবহার হবে। যদি সেটা সম্ভব না হয়, তাহলে পূর্ব পাকিস্তান বিভক্ত হওয়াই শ্রেয়। এই দুইয়ের

মাঝখানে তাদের নিকট তৃতীয় কোন পথ ছিলো না।

21

তাই এমনটাই মনে হয় যে, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে শেখ মুজিব নয় ; বরং ভুট্টোর মতোই বাঙালি বিরোধী পাকিস্তানি জেনারেলরাই দায়ী ছিলেন । এম তাজউদ্দিন ও সিরাজুল আলমের অনুসারীরাও দায়ী ছিলেন। যারা পাকিস্তানকে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে নিজেদের ভাগের দায়িত্ব ঠিকঠাকভাবে পালন করে। এক্ষেত্রে কিছু রাষ্ট্রও ভূমিকা রেখেছে ; যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারত । এরা খুবই সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা পালন করেছিল।

ঢাকার পতনের জন্য দায়ী কে?

পূর্বের আলোচনা থেকে পাঠকের কাছে স্পষ্ট যে, ১৯৭১ সালের ঘটনাবলী দৃশ্যমান হবার পেছনে একাধিক ধরনের বেশ কিছু কার্যকারণ সক্রিয় ছিলো । জেনে বুঝে পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের বলি হওয়া , সামরিক নেতৃত্ব , ভূ - রাজনৈতিক কারণসমূহের ভিত্তিতে ভারত ও রাশিয়া কর্তৃক পাকিস্তানকে বিভক্ত করার আকাঙ্ক্ষা , পশ্চিম পাকিস্তানের স্টাবলিশমেন্টের পক্ষ থেকে বাঙালি মুসলিমদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা,

21 মওদুদ আহমদ রচিত Bangladesh: Constitutional Quest for Autonomy

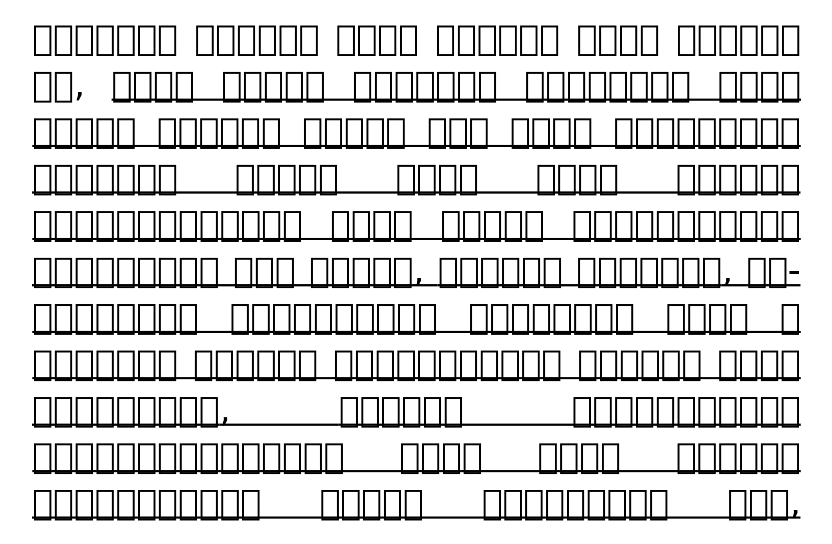

কট্টরপন্থী ছাত্র সংগঠন এবং সেগুলোর বাঙালি জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি - এই সমস্ত বিষয় মিলিয়ে অবস্থা এমন হয়ে যায় যে , সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা না করে আর উপায় থাকে না । ভারতের চৌকস মুশরিক রাজনীতিবিদ ইন্দিরা গান্ধীও সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা পালন করেন। ইতিপূর্বে তার পিতা নেহেরু ১৯৬৩ সালে যা কিছু করতে অস্বীকৃতি জানান, ১৯৭১ সালে গান্ধী সেই সব কিছু করার দুঃসাহস দেখান।

মুজিবুর রহমান এই সমস্ত বিষয়ের পেছনে ভূমিকা রেখেছিলেন । কিন্তু তিনি একমাত্র ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি ছিলেন না। আর সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি
– এটা তো আরও আগে ছিলেন না।

মুজিব একজন পেশাদার রাজনৈতিক ব্যক্তি ছিলেন । তিনি নিজের লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সব দলকে রাজি খুশি রাখতে চাইতেন। তিনি আইয়ুব ও ইয়াহিয়াকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করতে সমর্থ হন যে , তিনি একজন পাকিস্তানি স্বদেশপ্রেমী । কিন্তু সেইসঙ্গে আগরতলা ষড়যন্ত্রেও তিনি যোগসাজশ রাখেন এবং তার দলের কট্টরপন্থী স্বাধীনতাকামী ছাত্র নেতাদেরকেও খুশি ও আশ্বস্ত রাখতে সফল হন। তিনি তার সমর্থক জনসাধারণের অস্পষ্ট , ধোঁয়াশাপূর্ণ আবেগ উদ্দীপনা ও দলান্ধতাকে নিজের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত নিপুণভাবে

ব্যবহার করে পূর্ব বাংলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতার মর্যাদায় নিজেকে অভিষিক্ত করেন ।

দুইটি নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সৃষ্টিতে কৃতিত্ব বিবেচনায় মুজিবের তুলনা হতে পারে জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে। জিন্নাহ তার কর্মকুশলতার মাধ্যমে অনেক পরিবর্তন এনেছিলেন। ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশ ভারত বিভক্তির ক্ষেত্রে সমঝোতা করার জন্য বেশ উদ্বুদ্ধ ও রাজি ছিলেন। একইভাবে শেখ মুজিবও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পাকিস্তানকে নিজের অধীনে ঐক্যবদ্ধ ও অবিভক্ত রাখার জন্য পুরোপুরি সচেষ্ট ছিলেন। যদি নেহেরু এবং কংগ্রেস পার্টির অন্যান্য লিডাররা একটি যৌথ ও ঐক্যবদ্ধ হিন্দুস্তানের প্রস্তাবে একমত হয়ে যেত , মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে উপযুক্ত পরিমাণ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে যদি দেশ অখণ্ড থাকার সিদ্ধান্ত হতো , তাহলে আজ দুনিয়ার বুকে কোন পাকিস্থানের অস্তিত্ব থাকতো না ।

জিন্নাহ হিন্দুস্তানি মুসলিমদের একক তর্জুমান (মুখপাত্র) ছিলেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিব বাঙালিদের একক রাহবার ও মুখপাত্র ছিলেন না। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাক ফৌজের অপারেশন আরম্ভ হওয়ার আগেও শেখ মুজিবের অনেক কাছের সঙ্গী এবং

মাওলানা ভাসানীর মতো বড় মাপের রাজনীতিবিদরা পূর্ব পাকিস্তান অথবা বাংলাদেশের জন্য পুরোপুরি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে ছিলেন। তাদের বিপরীতে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার জন্য অবিভক্ত পাকিস্তানে শুধু জননির্বাচিত শাসন এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে চাচ্ছিলেন।

এদিকে ভুট্টো এবং দখলদার স্বভাবের পাকিস্তানি জেনারেলরা কখনোই এটা চাই তো না যে , পাকিস্তানের উপর বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের নির্বাচিত সরকারের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক । পাকিস্তানিরা বিভিন্ন ধরনের বড় বড় শর্ত দেখাতো। ২৫ শে মার্চের সেনা অপারেশন এবং পূর্ব পাকিস্তানে জাতিগত নিধনের মাধ্যমে যুদ্ধ বাঁধিয়ে তারা পাকিস্তানের উভয় বাহুর মাঝে কোন রকম সমঝোতা ও সন্ধি চুক্তির সম্ভাবনাকে দূর করে দেয়। পরবর্তীতে পানি অনেকদূর গড়িয়ে যায় এবং ফিরে আসা সম্ভব হয় না।

ফলাফল ও শিক্ষা

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের ঘটনাবলী আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত বহন করে আছে। এই বাস্তবতা বোঝা অত্যন্ত জরুরি যে, সাহিত্য - সংস্কৃতি , বংশধারা এবং

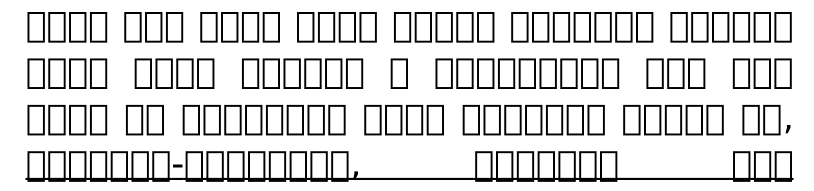

দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে কোন জাতি গোষ্ঠীকে পরাস্ত করার চেষ্টা কখনও সফল হয় না। নিজেদের রুসম রেওয়াজ, ভাষা, রুচি - প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদের উপর চাপিয়ে দেয়া যায় না। কোন জাতি গোষ্ঠী এটা মেনে নিতে পছন্দ করে না। এজন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ঈমান ও তাওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করেছেন, পরস্পরে জুড়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এটাই সেই পরিচয় যা অন্য সকল পরিচয় ও নিদর্শনের চেয়ে মূল্যবান। যখন আমরা ঈমানের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও পরস্পর সংহত হই, তখন আমরা অন্য জাতির তাহযীব -তামাদ্দুন, রুসম -রেওয়াজ, প্রথা -প্রচলন, ভাষা, স্বভাব -সংস্কৃতি এবং বংশধারাকে শ্রদ্ধা করতে এবং সেসব মেনে নিতে শিখি (তবে সেটা এই শর্তে, এগুলোর কোনটাই আল্লাহর শরীয়তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না)। এভাবেই আমরা একে অপরের দ্বারা উপকৃত হই।

আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তাআলা ইরশাদ করেন:

يٰاَ يُّهَا النَّا سُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَا رَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

অর্থ: “হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে

পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে -ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেজগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ , সবকিছুর খবর রাখেন। ” (সূরা আল হুজুরাত আয়াত নং ৪৯ :১৩)

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে এরশাদ করেছেন:

فليس لعـربي على عجمي فضـل ولا لعجمي على عــربي فضـــل ولا لأســود على أبيض ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى

অর্থ : “তাকওয়ার বৈশিষ্ট্য ছাড়া অন্য কোন দিক থেকে কোন আজমীর ওপর কোন আরবের, কোন আরবের ওপর কোনো আজমীর, কোন সাদা চামড়ার ওপর কৃষ্ণ বর্ণের এবং কোন কৃষ্ণ বর্ণের ওপর কোন সাদা চামড়ার লোকের কোন রূপ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। ”[22]

ইসলামী শিক্ষাগুলো কতই না সুন্দর ! এটা সেই ইসলাম যা আবিসিনিয়ার বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং কুরাইশের মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এক করে দিয়েছে। এই ইসলাম পারস্যের সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং রোমের শুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মিলিয়ে দিয়েছে। এই ইসলাম আউস ও খাজরাজ গোত্রের জানি দুশমনিগুলোকে

[22] তাবরানী রচিত আল-মুজামুল কাবির

(প্রাণের শত্রুতা) ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে পাল্টে দিয়েছে।

ইসলাম কতই না চিত্তাকর্ষক! গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা অগণিত গোষ্ঠী এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমের কতশত জাতিকে ভ্রাতৃত্বের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করেছে। কত চমৎকার এই ইসলাম , যা এমন এক ব্যবস্থা প্রদান করেছে যেখানে সব ধরনের পুরনো ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির মানুষগুলো ঈমান ইনসাফের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছে । কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে , আজ আমরা নতুন নতুন রাজনৈতিক চিন্তা , সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ , নতুন নতুন জাতিচিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে একটি পূর্ণাঙ্গ ও দৃষ্টান্তমূলক আদর্শ থেকে কতটা দূরে চলে গিয়েছি !!

পাকিস্তানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা শেখ মুজিব আসার অনেক আগেই হয়েছিলো; ১৯৭১ সালে জমানো ক্ষোভ বিস্ফোরিত হওয়ারও আগে। পাকিস্তানের সঙ্গে অবিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতা তো মুসলিম লীগও করেছে। এরা উপমহাদেশের মুসলিমদেরকে ইসলামী ভূখণ্ডের স্বপ্ন দেখিয়ে স্বপ্নপূরণের পথে কখনও পা বাড়ায়নি। ইসলামের নামে তারা এমন এক ধর্মহীন সেক্যুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে, যা আজ পর্যন্ত ইসলামের সর্ব নিকৃষ্ট শত্রুদের সাহায্যে কাজ করে যাচ্ছে।

পাকিস্তানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা পাক সেনাবাহিনীই করেছে। তারা পাকিস্তানের জন্মেরও আগে পশ্চিমাদের তাবেদার ও গোলাম ছিলো এবং আজও আছে। এই সেনাবাহিনীর বিশেষ দক্ষতা হলো মুসলিমদেরকে হত্যা করা—চাই তারা পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম হোক অথবা আফগানিস্তানের বর্ডারের পাশে বসবাসকারী গোত্রগুলোর মুসলিম হোক।

পাকিস্তানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা তো করেছে সুশীল সমাজের দ্বারা প্রভাবিত রাজনৈতিক শ্রেণিগুলো, যারা এক রকমের উত্তরাধিকার সূত্রে শাসন ব্যবস্থায় শামিল হয়ে আছে এবং পুরো দেশকে যারা নিজেদের জমিদারি মনে করে।

পাকিস্তানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা তো ঐদিন হয়ে গেছে, যেদিন মানব রচিত আইন-কানুন ও দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের চেয়ে বেশি গুরুত্ব ও মর্যাদা লাভ করেছে। আজ আমরা দেখি যে, পশ্চিমা সংস্কৃতির LGBTQ ধরনের অসভ্যতাকে প্রকাশ্যে পাকিস্তানে অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। এটা হচ্ছে ঐ রাষ্ট্রব্যবস্থার অবস্থা, যে রাষ্ট্র ইসলামের নামে কায়েম হয়েছিলো।

অপর দিকে বাঙালিদের হাতে কি এসেছে? আজ বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি ভারতের আবেষ্টনীতে নিরূপায় একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। আজ সংস্কৃতি ও বাঙালী পরিচয়ের নামে ইসলামের

উপর আক্রমণ করা হয়। সরকার জনসাধারণকে গুম করে ফেলে, খুন করে। প্রধানমন্ত্রী এবং তার নিকৃষ্ট সহকারীরা ডলার লুট করতে ব্যস্ত। উলামায়ে ইসলাম নজরবন্দী ও জেলে আবদ্ধ। ইলমে নববীর শিক্ষার্থী ও ধারক বাহকদের উপর গুলি করা হয়। মা বোনদের সম্ভ্রম, সম্মান হেফাযতে নেই। পুরুষরাও অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে নিয়মিত।

বাস্তবতা হলো, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ উভয় দেশ নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। উপমহাদেশের মুসলিমদের চাওয়া ছিলো ‘ইসলাম’। তারা একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের অধীনে আসার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতো। কিন্তু এর পরিবর্তে তারা কি পেয়েছে?

কোথাও আমেরিকা আর কোথাও ভারতের দাসত্ব! তাহলে আমরা কি অর্জন করলাম আর কি হারালাম? আমরা কাদের আনন্দে অংশ নিবো, আর কাদেরকে দোষ দিবো? সেটা কোন পথ, যা আমাদের অবলম্বন করা উচিত ছিলো? অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কিরূপ পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন ছিলো?

কতটা সময় পার হয়ে যাচ্ছে, আর আমরা অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। একটা দীর্ঘ সময় ধরে আমরা পরস্পরে যুদ্ধ করে যাচ্ছি। দীর্ঘ একটা কাল ধরে আমরা মানব রচিত আইন-কানুন ও দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে হারিয়ে গিয়ে নীরব হয়ে আছি।

এখন সময় এসেছে আমাদের জেগে ওঠার। সময় এসেছে সত্যপানে অগ্রসর হবার। আলোর রাজপথে উঠে আসার সময় এসেছে। নিজেদের ইসলাম নিয়ে গর্বিত উপমহাদেশের মুসলিম—চাই পাঞ্জাবি হোক অথবা সিন্ধি , পশতুন হোক কিংবা আরাকানী , বাঙালী হোক অথবা তামিল, কিংবা অন্য যে কোন জাতিগোষ্ঠীর মুসলিম হোক না কেন - সকলেই একসঙ্গে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বের হয়ে ইসলামের আলোকময় রাজপথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হেঁটে চলার সময় হয়েছে । তাওহীদ ও একত্ববাদের বিশুদ্ধ ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে জিহাদ করে সুজলা - সুফলা সজীব শ্যামলা অঞ্চলের চমৎকার মানুষগুলোকে স্বাধীন করা এবং সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ পবিত্র শাসনব্যবস্থা কায়েম ও বাস্তবায়ন করা উপমহাদেশের সকল মুসলমানের দায়িত্ব ।

***